বোটানিক গার্ডেন সম্পর্কে পরিচিতি
এবং
উদ্ভিদের পরিবহনের ইতিহাস

বোটানিক গার্ডেন সম্পর্কে পরিচিতি (Introduction about the Botanic Garden)

বোটানিক গার্ডেন হল একটি উন্মুক্ত সংগ্রহশালা যেখানে অসংখ্য গাছপালা, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, লতানো উদ্ভিদ ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাজানো হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শ্রেণীবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে তাদের গায়ে লেবেল লাগানো হয়। বিভিন্ন গাছের ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতিগুলিকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য স্বজাতীয় বা ঘনিষ্ট গ্রুপের উদ্ভিদগুলি একই জায়গায় চাষ করা হয়। পার্কেও আমরা বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পাই, কিন্তু সাধারণ পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে বোটানিক গার্ডেনের প্রধান পার্থক্য হল এই ধরণের বৃক্ষোদ্যানগুলিতে বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীর সংরক্ষণের জন্য এবং উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণার জন্য এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগী জমি তৈরী করে সেখানে জিম্‌নোস্পার্ম, পাইন ও তজ্জাতীয় উদ্ভিদের বাগিচা, স্ক্রু-পাইনের বাগিচা, অর্কিডের বাগিচা, বাঁশ ঝাড়, তাল গাছের বাগিচা, ক্যাক্‌টাসের বাগিচা ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

আগে বোটানিক গার্ডেন তৈরী করার পিছনে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়া বা জলবায়ুতে বেড়ে ওঠার জন্য অভ্যস্ত করে তোলা, যাতে তাদের নতুন জায়গায় চাষ করা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী আরো উন্নত মানের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন সংকরণ, নির্বাচন, বিভিন্ন ধরণের পরাগযোগ ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে। এছাড়া বোটানিক গার্ডেন থেকে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায়, কারণ এইটি হল স্বজাতীয় এবং বিদেশী উদ্ভিদের একটি জীবন্ত সংগ্রহস্থল।

বর্তমানে বিশ্বে মোট ২০০০টি বোটানিক গার্ডেন আছে এবং ভারতবর্ষে আছে প্রায় ১২০টি (বিশ্ববিদ্যালয়, পৌর এবং আঞ্চলিক উদ্যানগুলি এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত)। হাওড়া জেলায় অবস্থিত ভারতীয় বোটানিক গার্ডেন আগে 'কোম্পানি বাগান' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বিশ্বের সেরা ভূ-দৃশ্য (landscape) গার্ডেনগুলির মধ্যে অন্যতম কলকাতার রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতীয় বোটানিক গার্ডেনে নামে পরিচিত। ভারতীয় বোটানিক গার্ডেনের ইতিহাস টেম্‌স্ নদীর তীরে অবস্থিত ইংল্যান্ডের কিউ বোটানিক গার্ডেনের অনুরূপ। কিউ বোটানিক গার্ডেন লন্ডন থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। কিউ বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৫০ বছর পূর্বে অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে হাওড়ায় ভারতীয় বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে একটি অনুর্বর এলাকায় ১৫ একর জমির ওপর ১৮৪১ সালে কিউ বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে সুপরিচিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হুকার, যিনি রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন, কিউ-এর প্রথম পরিচালক ছিলেন তাঁর অধীনে ২৮৮ একর এলাকায় এই গার্ডেনের বিস্তৃতি লাভ হয়। অপরদিকে ১৭৮৭ সালে কোল রবার্ট কীড হুগলী নদীর তীরে কলকাতা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ৩০০ একর এলাকা জুড়ে রয়্যাল বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। এই গার্ডেনটি বর্তমানে ২৭৩ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই বৃক্ষোদ্যানটি পৃথিবীর প্রাচীনতম বৃক্ষোদ্যানগুলির মধ্যে অন্যতম এবং সবচেয়ে বেশী এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বৃক্ষোদ্যান হিসাবে পরিচিত ছিল।

The Great Banyan Tree of AJCBIBG, Howrah

The Kyd's Monument at AJCBIBG, Howrah

বর্তমানে ২৭৩ একর এলাকা জায়গা জুড়ে ২৫ টি ভাগে বিভক্ত ১৩৭৭ প্রজাতির উদ্ভিদ এই বাগানটিকে একটি জীবন্ত সংগ্রহস্থলে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়া এই বাগানটিতে ২৮টি হ্রদ আছে যারা পরস্পর সংযুক্ত এবং প্রতিটি হ্রদ গঙ্গা নদীর সঙ্গে স্লুইস এর মাধ্যমে সংযুক্ত। উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করার জন্য এবং কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য এই বাগানটি হল একটি অনন্য স্থান। এই বাগানটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণগুলির মধ্যে 'গ্রেট বটবৃক্ষ' হল উদ্ভিদজগতের মধ্যে একটি জীবন্ত আর্শ্চয। এই বাগানের অন্যান্য আকর্ষণগুলি হল বিগ পাম্ হাউস যেখানে করতল জাতীয় উদ্ভিদ যেমন লোডোইসিয়া মালডিভিকা *Lodoicea maldivica* (ডবল নারকেল পাম্), ইজিপ্ট থেকে সংগৃহীত শাখাবিন্যাস করতল (Branching palm) যেমন হাইফেনে থেবাইকা *Hyphane thebaica*, সেন্চুরী পাম কোরাইফা ম্যাক্রোপোডা (*Corypha macropoda*), আমাজন নদী থেকে সংগৃহীত জায়েন্ট লিলি - ভিক্টোরিয়া আমাজোনিকা (*Victoria amazonica*), বার্মা থেকে সংগ্রহীত পুষ্প প্রদানকারী উদ্ভিদের রাণী - আমহার্সটিয়া নোবিলিস (*Amherstia nobilis*), পাহাড়ি গোলাপ বা ভেনেজুয়েলা গোলাপ - ব্রাউনিয়া প্রজাতি (*Brownia sp.*), আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত কল্পবৃক্ষ আদানসোনিয়া ডিজিটাটা (*Adansonia digitata*), আফ্রিকার সসেজ বৃক্ষ - কিগেলিয়া পিনাটা (*Kigelia pinata*), রসগোল্লা বৃক্ষ ক্রাইসোহাইলাম কাইনিটো (*Chrysohyllum cainito*), ক্যানন বল বৃক্ষ - কৌরৌপিটা গুইয়ানেনসিস্ (*Couroupita guianensis*), পাগল বৃক্ষ টেরিগোটা আলাটা var ইরেগুলারিস (*Pterigota alata* var *irregularis*), এবং বাতিস্তম্ভ বৃক্ষ - পারমেনটিয়েরা সেরিফেরা (*Permentiera cereifera*) ইত্যাদি।

উদ্ভিদ জগৎকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বর্তমানে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বোটানিক গার্ডেনকে একটি সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই বাগানটি বর্তমানে দেশের নির্বাচিত বিদেশী প্রজাতি, বিরল এবং কবলিত প্রজাতির উদ্ভিদদের একটি নিরাপদ আবাসস্থল। ফলস্বরূপ, এই বাগানটি নির্বাচিত অর্থকারী, শোভাময় এবং ভেষজ উদ্ভিদ এবং তাদের বন্য বংশধরদের জীবাণু প্রাণরস সংগ্রহ (germ plasma collection)-স্থলে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও এই বাগানটি উদ্ভিদের মূল্য এবং বিভিন্ন কৌতূহলী, সুন্দর, চিত্তাকর্ষক উদ্ভিদের আনন্দদায়ক প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষামূলক কাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই বৃক্ষোদ্যানে এছাড়াও ফুল, পর্ণরাজি এবং বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রদর্শনী হয় এবং বীজ ও চারাগাছের আদান প্রদানের আয়োজন করা হয়। সামগ্রিকভাবে বোটানিক গার্ডেন সম্পর্কিত সকল তথ্য এই বাগানটি থেকে পাওয়া যায়।

১৭৮৭ সালে এই বাগানটি প্রতিষ্ঠার সময়ে বাংলায় 'গ্রেট বেঙ্গল দুর্ভিক্ষ' দেখা দিয়েছিল, যার ফলে বাংলায় পরবর্তীকালে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেতে সেই সময় বিভিন্ন ফসল এবং অর্থকারী উদ্ভিদ যেমন চা, কফি, মেহগনি, সেগুন, এলাচ, দারুচিনি, সিন্কোনা, তুলা, নীল, জায়ফল, গোলমরিচ, লবঙ্গ, আখ, আলু, কোকো ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রয়োজনীয় খাদ্য, সবজি, ফল, তেল, তন্তু, কাঠ এবং শোভাময় উদ্ভিদের চাষ এই ঐতিহাসিক বাগানটিতে শুরু হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং বাণিজ্যিক চাষের জন্য এই গার্ডেনে উৎপাদিত ফসল সেই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিতরণ করা হয়েছিল।

উদ্ভিদের পরিবহনের ইতিহাস (History of Transportation of Plants)

আমরা আমাদের চারপাশে যে সকল গাছপালা দেখতে পাই সেইগুলির মধ্যে বেশ কিছু উদ্ভিদ বিভিন্ন দেশ থেকে এনে আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ুর সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে চাষ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্য যেমন ধান, শাক-সব্জি যেমন আলু, রিফ্রেশিং পানীয় যেমন চা, কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদ যেমন মেহগনী, মশলা যেমন জায়ফল, ঔষধি গাছ যেমন সিন্কোনা ইত্যাদি অন্যান্য দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে কিভাবে আমাদের দেশে বিস্তৃত হল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

ধান (Rice) :

ধান পোয়েসি (*Poaceae*) or গ্রামিনেয়ি (*Graminae*) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। ধানের বিজ্ঞানসম্মত নাম হল ওরায়জা স্যাটিভা (*Oryza sativa*)। সম্ভবত চাল হল মানবজাতির সবথেকে প্রাচীনজাত খাদ্যশস্য যেটি চীনারা ৫০০০ বছর পূর্বে প্রথম চাষ করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী চীনের ইয়াংজি (Yangtze) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চীনারা প্রথম ধানের চাষ শুরু করেছিলেন এবং সেখান থেকে ধানচাষ অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পরে। বর্তমানে ধান হল পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার প্রধানতম খাদ্য, প্রধানত এশিয়া মহাদেশ অঞ্চলে। ধান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদিত খাদ্যশস্য। এশিয়া হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশী ধান উৎপাদনকারী মহাদেশ এবং বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের ৯০ শতাংশই এশিয়ায় উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষে ও চীনে ধান সবচেয়ে বেশী খাদ্যশস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এশিয়া মহাদেশ ব্যতীত ব্রাজিলও ধান উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

A close view of rice grain

চীনা কৃষকেরা প্রথম মনুষ্যসৃষ্ট পুকুরে জল সংরক্ষণ এবং আগাছা ধ্বংস করার জন্য ধান চাষ শুরু করেন। পরবর্তীকালে খুব দ্রুত চীন থেকে ধানচাষ পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এইটি মনে করা হয় যে, ভারতবর্ষে ৩০০০ বছর পূর্বে স্থানীয় মানুষেরা পরীক্ষামূলকভাবে ধান চাষ শুরু করেন, যদিও ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বে হরপ্পান সময়কালে ধানচাষের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

A view of rice cultivation in Mussoorie hills in India

ইতিহাসবিদরা মনে করেন প্রাথমিকভাবে ভারতে দুটি প্রজাতির ইন্ডিকা (*indica*) এবং জাপানিকা (*japanica*) ধানের চাষ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে প্রথম ইন্ডিকা (*indica*) প্রজাতির ধানের চাষ শুরু হয়। জাপানিকা (*japanica*) প্রজাতির বন্য ধানের চাষ প্রথমে দক্ষিণ চীনে শুরু হয়। বহুবর্ষজীবি বন্য ধান এখনও আসাম ও নেপালে চাষ করা হয়। ভারতে ধান সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে চালের দানাগুলি হল দুই ভাইয়ের মতো, যারা একজন অপরজনের খুবই নিকট থাকে কিন্তু একে অপরের সঙ্গে জুড়ে থাকে না। ধানচাষ ভারতবর্ষের উর্বরতা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। অতঃপর নবদম্পতি দ্বারা চাল নিক্ষেপ করা ভারতবর্ষের একটি প্রধান রীতি। উপরন্তু কঠিন খাদ্য হিসাবে শিশুদের প্রথম চাল থেকে তৈরী খাবারই খাওয়ানো হয়। কেউ কেউ বলেন রাইস্ শব্দটি তামিল শব্দ 'arisi' থেকে এসেছে।

বিশ্বব্যাপী চল্লিশ হাজার (৪০,০০০) প্রকারের ধান পাওয়া যায়। আফ্রিকান প্রকারের ধান ওরাইজা গ্লাবেরিমা (*Oryza glaberima*) নামে পরিচিত। ভারতে প্রায় বিরাশি হাজার সাতশো (৮২৭০০) প্রকারের লোক-ধান (folk rice) পাওয়া যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানে ৪১৫টি লোক-ধানের প্রজাতি, ৫০০০-এর বেশী সাধারণ ধানের প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে ১৫০টি ধানের প্রকার চাষ করা হয়। ভারতে জন্মানো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধানের প্রকারগুলি হল - শতাব্দী, রাশি, সাশয়াশ্রী, ক্ষিতিশ (সেচ ক্ষেত্রের জন্য), পিএনআর ৩৮১ (PNR 381) উচ্চভূমির জন্য, মনোসরোভর, স্বর্ণধান, শশী (অগভীর জমির জন্য), সবিতা, মধুকর, ভূদেব (আধা গভীর জলা-জমির জন্য), নিরজা, জলপ্রিয়া, জিতেন্দ্র (গভীর জলা জমির জন্য), সিএস্আর ১০, ১৩ এবং ২৭ (লবণাক্ত মাটির জন্য)।

বর্তমানে আর্ন্টাকটিকা মহাদেশ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র ধানের চাষ হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা এবং বাংলাদেশ অন্যতম।

আলু (Potato) :

Potato - Solanum tuberosum

আলুর ইংরাজী শব্দটি 'পোটাটো' (Potato) স্প্যানিশ শব্দ 'পাটাটা' যার অর্থ মিষ্টি আলু (*Ipomoea batatas*) থেকে উদ্ভুত হয়েছে। আলুচাষ শুরু হওয়ার প্রায় ৮০ বছর পূর্বে পেরু থেকে ইউরোপে মিষ্টি আলুর চাষের পদ্ধতির সূচনা হয়। আলুর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল সোলানাম টিউবারোসাম (*Solanum tuburosum*)। ৮০০০ থেকে ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বের অন্তবর্তী সময়ে পেরু এবং উত্তর বলিভিয়াতে প্রথম আলুর চাষ শুরু হয়। মধ্য পেরুর অন্‌কোন থেকে প্রাপ্ত আলুর কন্দের অংশবিশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক যাচাই করে দেখা গেছে যে কন্দটি ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব পুরানো। ভুট্টা, গম ও চালের পরে আলু হল বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম খাদ্য-ফসল। আমেরিকা থেকে দক্ষিণ চিলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জায়গায় বন্য প্রজাতির আলুর চাষ হয়।

যেহেতু আলু গাছ খুব সহজেই বৈচিত্রপূর্ণ জলবায়ু যেমন ঠান্ডা এবং আর্দ্র জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় এবং যেখানে শ্বেতসারযুক্ত কন্দ গঠনের জন্য পর্যাপ্ত জলের যোগান থাকে সেখানে খুব সামান্য প্রচেষ্টার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদিত হয়। আলু খুব বেশীদিন গুদামঘরে মজুত করে রাখা যায় না। কারণ আলুর কন্দগুলি ছত্রাকের খুব প্রিয় খাদ্য, তাই ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। ফুল ফোটার পর আলু গাছে ছোট ছোট সবুজ রঙের ফল আসে যেগুলি সবুজ চেরী-টমেটোর অনুরূপ দেখতে হয় এবং এক-একটি ফলে ৩০০টির মত বীজ থাকে। আলুর কন্দ ব্যতীত অন্য সকল অংশই খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত, কারণ আলুর ফলে বিষাক্ত উপক্ষার সোলানিন থাকে। আলুর সবুজ পত্র এবং কন্দের সবুজ ত্বক সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত থাকলে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাই এগুলি খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত। আলুর মধ্যে শ্বেতসারের পরিমাণ বেশী থাকায় এই খাদ্য-ফসলের পরিচিতি সবচেয়ে বেশী। একটি মধ্য আকৃতির আলুতে প্রায় ২৬ গ্রাম শ্বেতসার থাকে এবং এই শ্বেতসারের মধ্যে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে। এছাড়া আলুতে ভিটামিন, মিনারাল, ক্যারোটিনয়েড এবং প্রাকৃতিক ফেনল থাকে।

আলুর কন্দের প্রকারভেদ (Potato Tubes – Various Shades) : ফুড এবং এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের বিবরণ অনুযায়ী ২০১৩ সালে বিশ্বে মোট ২৬৮ মিলিয়ন টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ৫০০০ প্রকারের আলু পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে ৩০০০ প্রকারের আলু শুধু আন্দিজ-এ পাওয়া যায়, প্রধানত পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, চিলি এবং কলোম্বিয়ায়। ট্যাক্সোনমিক স্কুলের মত অনুসারে আলুর ৮ থেকে ৯টি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। ৫০০০ প্রকার চাষের উপযোগী আলুর প্রকারভেদ ছাড়াও আরো ২০০ প্রজাতিকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে বন্য প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির আলুর সঙ্গে ক্রমাগত ক্রস্‌ব্রিড করানো হয় যাতে বন্য প্রজাতির আলুগুলির জিন সাধারণ চাষের উপযোগী আলুর প্রকারভেদের জিন-পুলে স্থানান্তরিত হয়। আলুর কন্দ থেকে যে আলু গাছগুলি জন্মায় তারা পিতামাতার জিনের বৈশিষ্ট্য বহন করে। কিন্তু আলুর ফলের বীজ থেকে যে আলু গাছগুলি জন্মায় তাদের প্রকারভেদ বিভিন্ন হয়।

Potato tubers - various shades

আলুর ভারতে প্রবেশের প্রাথমিক ইতিহাস আমাদের অজানা। ভারতবর্ষে আলুর ইতিহাস ৪০০ বছরের পুরানো। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্তুগীজদের হাত ধরেই ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্তী অঞ্চলে রাঙা-আলুর চাষ শুরু হয়। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস-এর প্রতিনিধি এডওয়ার্ড টেরি মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে (১৬১৫-১৬১৯) প্রথম সমকালীন পূর্ব ভারতে আলুর উপস্থিতির কথা বলেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের (১৭৭২-১৭৮৫) সহায়তায় অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমভূমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলু চাষ শুরু হয়, এবং আলুর বিভিন্ন প্রকারগুলির স্থানীয় নাম হল ফুলওয়া Phulwa (সমভূমিতে ফুল ফোটা), গোলা Gola (গোলাকৃতি আলু), সাঠা (ষাট দিনে পরিণত হয়) প্রভৃতি। সেই সময় আলু ছিল স্বল্প পরিমাণে উৎপাদিত বাগানের সব্জি, কখনো কখনো উচ্চতর স্থানে গ্রীষ্মকালীন ফসল হিসাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলু উৎপাদিত হত। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা প্রথম বাংলায় আলুকে রুট ফসল হিসাবে পরিচয় করান। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে আলুচাষ বিস্তৃতি লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দিতে আলু ভারত থেকে তিব্বতে বাণিজ্যিক পথে বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে ভারতে আলু উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম এবং উত্তরপ্রদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

ভারতীয় আবহাওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের আলুর উৎপাদন এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে আরো তরান্বিত করার জন্য সিমলায় ১৯৪৯ সালে দি সেন্ট্রাল পোটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট (The Central Potato Research Institute) স্থাপন করা হয়।

১৯৫০ সালের মধ্যে ৩২ প্রকার আলু শনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ১৬ প্রকার আলু ইউরোপ থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং বাকী ১৬টি স্থানীয় দেশী প্রকারের আলু। ২০০২ সালের মধ্যে সেন্ট্রাল পোটাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট আরো ৩৫ প্রকার আলু এই তালিকায় সংযোজন করেছে, যার ফলে বিভিন্ন প্রকারের আলুর চাষ এবং উৎপাদন দুই-ই ভারতে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আলু হল ভারতের সবচেয়ে দ্রুত উৎপাদিত প্রধান ফসল।

যে সকল প্রকারের আলু ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকারগুলি হল - কুফ্রি জ্যোতি, কুফ্রি বাদশা, সুপার জ্যোতি, কুফ্রি, অশোকা, কুফ্রি সিন্ধুরি, কুফ্রি জহর, কুফ্রি সুজ্লেট, কুফ্রি পুস্পর, আটলান্টিক, ডায়মন্ড, লেডি রোসেটা, সান্তনা ইত্যাদি।

চা (Tea) :

এক কাপ চা ব্যতীত একটা দিন কল্পনা করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। ভারতে ঔষধ হিসাবে এবং রিফ্রেশিং পানীয় হিসাবে চা-চাষের ইতিহাস খুবই দীর্ঘ। চীন থেকে প্রথম কবে চা উৎপাদন পদ্ধতি ভারতে প্রবেশ করেছিল তা সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। রক্সবার্গের সময়কালে (১৮৯৫-১৯১৪) গুয়াংঝাউ (Guangzhou) থেকে ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন, হাওড়ায় প্রথম চা-চাষের সূচনা হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে চা উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য একটি টি-কমিটি গঠন করে। যার প্রতিনিধি ছিলেন ডঃ এন ওয়ালিচ, জি. জে. গর্ডন এবং ডব্লু গ্রান্ট। তবে চীনা চা মানুষের মনে খুব একটা উৎসাহ জোগাতে পারেনি।

১৮২৩ সালে রবার্ট ব্রুস নামে একজন আর্মি অফিসার আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ভ্রমণকালে স্থানীয় কিছু উপজাতির মানুষ যারা 'সিন পো'(Singpho) এবং 'খামতি' (Khamti) নামে পরিচিত তাদের স্থানীয় চায়ের ঝোপ থেকে প্রাপ্ত চা-পাতা দিয়ে চা বানিয়ে খেতে দেখেন। পরবর্তীকালে তাঁর ছোট ভাই আলেকজান্ডার তাঁরই পথ অনুসরণ করেন এবং সেখান থেকে চা-গাছের চারা নিয়ে এসে ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন হাওড়ায় রোপণ করেন। ১৮৩৪ সালে ফ্রান্সিস জেন্কিনস্ এই বোটানিক গার্ডেনে পরীক্ষামূলকভাবে বৃহৎ অঞ্চলে চা-চাষ শুরু করেন এবং ডঃ ওয়ালিচ্ জেন্কিনস্-এর প্রেরিত চা-গাছের

চারা ক্যামেলিয়া থেইফেরা (*Camellia theifera*) নামে সনাক্ত করেন, যা বর্তমানে চায়ের উৎস হিসাবে পরিচিত। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন আসাম, দার্জিলিং, উটি, কোদাইকানাল, মুন্নার প্রভৃতি জায়গায় চায়ের চাষ শুরু হয়।

A tea estate

Tea plant in flowering (Camellia theifera)

বর্তমানে ভারত হল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ চা উৎপাদনকারী দেশ, যদিও ভারতে উৎপাদিত চায়ের ৭০ শতাংশ ভারতেই পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের চা-শিল্প থেকে অনেক বিশ্বব্যাপী চা-ব্র্যান্ড উত্থিত হয়েছে এবং ভারতের চা-শিল্প উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চা-শিল্প হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

চায়ের উৎপাদন, চায়ের মানের শংসাপত্র, রপ্তানির পরিমাণ এবং ভারতে চা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল বিষয়গুলি ভারতীয় টি-বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

মেহগনি (Mahogany) :

ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনের বিখ্যাত মেহগনি এভিনিউ দর্শকদের কাছে খুবই পরিচিত। ১৭৯৫ সালে ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই ওয়েষ্ট ইন্ডিজ থেকে প্রথম এই গার্ডেনে উচ্চমানের কাঠ প্রদানকারী মেহগনি গাছের চাষের সূচনা হয়। ইংল্যান্ডের কিউ বোটানিক গার্ডেনের ডিরেক্টর স্যার জে. ডি. হুকার বিভিন্ন প্রজাতির মেহগনি গাছ ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন, হাওড়ায় সরবরাহ করেন। ফলে ব্যাপক হারে মেহগনি গাছের চাষ এই গার্ডেনে শুরু হয় এবং এখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই গাছ বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে এই উচ্চমানের কাঠ প্রদানকারী গাছগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

A West Indies mahogany tree

Close view of fruit and leaf

জায়ফল (Nutmeg) :

মাইরিসটিকেসি (*Myristicaceae*) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত জায়ফলের বিজ্ঞানসম্মত নাম মায়রিসটিকা ফ্রাগরানস (*Myristica fragrance*)। এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মশলা যেটি আমরা খাবারে বিশেষ গন্ধের জন্য ব্যবহার করে থাকি। ইন্দোনেশিয়ার মোলুকাসের বান্দা দ্বীপপুঞ্জ হল এই মশলার আদি বাসস্থান। এশিয়া মহাদেশ বসবাসকারী ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বান্দা দ্বীপপুঞ্জের জায়ফলের ব্যবসা তাদের মুষ্ঠিতে নেওয়া, কারণ জায়ফল খুবই মূল্যবান এবং দামী মশলা যেটি মধ্যযুগে

ইউরোপীয় রন্ধনপ্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হত। জায়ফল হল গাছের বীজ যেটি ডিম্বাকৃতি, ২০ থেকে ৩০ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য, ১৫ থেকে ১৮ মিলিমিটার প্রস্থ এবং শুকনো বীজের ওজন ৫ থেকে ১০ গ্রামের মধ্যে। শুকনো অবস্থায় বীজগুলি একটি লাল আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত থাকে। এইটি একমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল যার থেকে এবং গাছের অন্যান্য অংশ থেকে দুই ধরণের মশলা প্রস্তুত করা হয়। চারাগাছ রোপণ করার ৭ থেকে ৯ বছর পরে এই গাছে প্রথম ফল আসে এবং এই গাছ থেকে পূর্ণ উৎপাদন পেতে প্রায় ২০ বছর সময় লাগে। এই গাছ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্যগুলি হল অপরিহার্য তেল (essential oil) এবং জায়ফল মাখন (nutmeg butter)। জায়ফল সাধারণত গুঁড়ো (dust) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

রক্সবার্গের বাগানের মালি মোলুকাস ভ্রমণের সময় জায়ফল গাছের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ১৭৯৮ সালে হাওড়ার ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনে এই গাছের চারা রোপণ করেন। পরবর্তীকালে এই বাগানে প্রচুর চারাগাছ তৈরী করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করার জন্য পাঠানো হয়। বর্তমানে ভারতের কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই গুরুত্বপূর্ণ মশলার চাষ হয়।

Nutmeg fruits

সিন্‌কোনা (Cinchona) :

কুইনাইন গাছের ঔষধি বৈশিষ্ট্য প্রথমে পেরু এবং বলিভিয়ায় বসবাসকারী 'কেচুয়া' (Quechua) জাতির মানুষ আবিষ্কার করেন। মাংসপেশীর শিথিলতা এবং ঠান্ডায় কাঁপুনির হাত থেকে রক্ষা পেতে এই জাতির মানুষেরা সিন্‌কোনা গাছের বাকল থেকে নিঃসৃত কুইনাইন ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করত। লিমায় বসবাসকারী ঔষধ প্রস্তুতকারী জেসুইট ভাই অগোস্টিনো সালুম্বর্নো Augostino Salumbrino (১৫৬১-১৬৪২) প্রথম কেচুয়া জাতির এই ঔষধ প্রস্তুতির বিষয়টি লক্ষ্য করেন। যদিও ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসাবে কুইনাইনের ব্যবহার তখনও অজানা ছিল এবং ঠান্ডা থেকে কাঁপুনি যে ম্যালেরিয়ার একটি লক্ষণ সেইটিও অজানা ছিল।

১৮৬১ সালে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ম্যালেরিয়া মহামারীর আকার ধারণ করে তখন হাওড়ায় ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট ছিলেন টমাস অ্যান্ডারসন। সেই সময় হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অ্যান্ডারসনই প্রথম ভারতে সিন্‌কোনা গাছের বিভিন্ন প্রজাতির চারা নিয়ে এসে হাওড়ায় বোটানিক গার্ডেনে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করেন। পরবর্তীকালে অ্যান্ডারসন মংপু এবং দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলেও সিন্‌কোনা গাছের চাষ শুরু করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অ্যান্ডারসন এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। হাওড়ায় বোটানিক গার্ডেনের অন্যান্য সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট যেমন সি. বি. ক্লার্ক (C. B. Clark) এবং জর্জ কিং (George King) তাঁর এই অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন। তাঁরা মংপু সিন্‌কোনা বাগানের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট হিসাবেও কাজ করেছেন।

A Cinchona plant growing in Cinchona Garden

Close view of seeds Mungpu, Darjeeling

ডঃ জর্জ কিং-এর সময় সিনকোনা সুসিরুব্রা (*Cinchona succirubra*) প্রজাতির উপক্ষার থেকে প্রাপ্ত কুইনাইন ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং চিকিৎসকদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর ম্যালেরিয়া রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য বাজারে প্রচলিত হয়।

এইভাবে ইন্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন ম্যালেরিয়া থেকে আরোগ্যের দ্বারা লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে।

উপসংহার (Conclusion)

আমরা আমাদের চারপাশে অনেক গাছপালা এবং শোভাবর্ধনকারী গাছের চাষ হতে দেখি, যদিও তাদের সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। প্রত্যেকটি ফসলের যেমন খাদ্যশস্য, ডাল, শাক-সব্জি, ঔষধি গাছ, কাঠ প্রদানকারী বা ফুল প্রদানকারী গাছ ইত্যাদির পিছনেও আকর্ষণীয় গল্প আছে। আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই, রিফ্রেশিং পানীয় উপভোগ করি তাদের প্রত্যেকেরই অনেক ইতিহাস আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই গাছেদের ইতিহাস এবং তাদের পরিবহন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, তাহলেই আমরা মানবজাতির ইতিহাস এবং কোন পথ ধরে এই ইতিহাস অতিবাহিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে অবগত হব। এছাড়া এই ধারণাগুলি পরবর্তী বংশধরদের কৃষি পরিকল্পনায় সাহায্য করবে।

Funded by :
Art & Humanities Research Council, United Kingdom

Organised by :
Centre for World Environmental History, University of Sussex
Royal Botanic Gardens, KEW
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Botanical Survey of India
Indian Museum, Kolkata